মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে রাধা ঃ সংস্কৃতির চাপান-উতোর

ড. শুভময় ঘোষ , সহযোগী অধ্যাপক , উলুবেড়িয়া কলেজ , উলুবেড়িয়া , হাওড়া

বিষয়-চুম্বক : যে-কোনো সংস্কৃতির চরিত্রই নানান বিপরীতমুখী স্রোতে আবর্তময় ও জটিল। তার আগ্রাসী , আধিপত্যকামী উপরিতলের রূপটি কখনও কখনও আপাতলক্ষ্যে দৃশ্যমান হলেও তলায় তলায় অপেক্ষাকৃত অনুচ্চকিত ধারাগুলির সঙ্গে ঐ আপাত-প্রধান ধারাটির স্রোত-সংঘাত ও মিথষ্ক্রিয়া নিরন্তর চলতেই থাকে। সেই পারস্পরিক প্রভাব , প্রতিস্পর্ধা ও নিয়ন্ত্রণে সর্বদেশকালেই সংস্কৃতির এক মিশ্র চারিত্র্যধর্ম লক্ষ করা যায়। বক্ষ্যমাণ নিবন্ধে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের একটি জনপ্রিয় বিশেষ মাত্রার নিরিখে বঙ্গের সাহিত্য-সংস্পৃষ্ট সংস্কৃতিতে বহুকালচলিত এই পারস্পরিকতাকে সন্ধান করা হয়েছে। ভারতবর্ষের পূর্বপ্রান্তীয় এই ভূখণ্ডে সাংস্কৃতিক পরিসরে আক্ষরিক অর্থেই ‘কানু বিনা গীত নাই’। যদিও সঠিক তাৎপর্যে বঙ্গের সাহিত্য , সমাজ কিংবা ধর্মতত্ত্বেও কৃষ্ণ একক প্রতিষ্ঠার অভ্রংলিহ গরিমা লাভ করতে পারেনি। বরং , এ দেশের জল-হাওয়ায় রাধার সঙ্গে কৃষ্ণের তথাকথিত অসামাজিক প্রেমের নাটকীয় আখ্যানই অনেক বেশি জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। যদিও সেই প্রতিষ্ঠার মূল্য চোকাতে হয়েছে রাধাকে এই প্রবল পুরুষতন্ত্রে ধাপে ধাপে নিজের স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্যকে ধাপে ধাপে মুছে ফেলে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব তত্ত্বে শেষপর্যন্ত এই রাধা রক্তমাংসের নারী থেকে নিখাদ তত্ত্বপ্রতিমায় প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। যদিও বঙ্গসংস্কৃতির আধিপত্যকামী , অভিজাত ধারায় রাধার এই সত্তাবিলোপ খুব সহজসাধ্য হতে পারেনি ;কেননা সংস্কৃতির অবতলের ধারাটি বারেবারেই সুযোগমতো প্রাধান্যবিস্তার করে ফিরেফিরেই রাধা চরিত্রের সেই সমাজ-প্রতিস্পর্ধী ব্যতিক্রমী সক্রিয়তাকে ফিরিয়ে দিতে চেয়েছে। বাংলা সাহিত্যে গোটা মধ্যযুগীয় কালপর্ব ধরে সংস্কৃতির এই ‘গ্রেট’ ও ‘লিটিল’ ট্র্যাডিশানের দ্বন্দ্ব অনুসন্ধিৎসু পাঠকের কাছে এক আকর্ষণীয় পর্যবেক্ষণের বিষয় হয়ে থেকে গিয়েছে।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে রাধা : সংস্কৃতির চাপান-উতোর

‘ব্রাহ্মণ যবনে বাদ যুগে যুগে আছে’ – বলেছিলেন মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের এক কবি। অথচ একালের সংস্কৃতিচর্চার পাঠশালায় পাঠ নিলে তিনি হয়ত দেখতে পেতেন সংস্কৃতির ভুবনে তার চেয়েও সত্য হয়ে আছে ‘গ্রেট ট্র্যাডিশান’ আর ‘লিটিল ট্র্যাডিশান’-এর অন্তহীন এক সংঘাত। প্রতিস্পর্ধী দুই সংস্কৃতির সেই দ্বন্দ্বে-দ্বৈরথে সবচেয়ে বেশি বিপর্যস্ত , রক্তাক্ত হয়েছিল মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে যে নারীর জীবন – আধুনিকতার তটভূমিতে দাঁড়িয়ে মধুসূদন দত্ত তাঁকে ডেকেছিলেন ‘Poor lady of Braja’ ব’লে।

বাংলায় মধ্যযুগের প্রেমকাব্যের প্রতিনিধিস্থানীয়া এই নায়িকা রাধা যে আদতে লোকসংস্কৃতিজাত এক প্রতিমা – সেকথা একরকম স্বীকৃতই বিদ্দ্বজনসমাজে। লোকসাহিত্যের খিড়কি পথেই এই নারী একদিন প্রবেশ করেছিল অভিজাত সাহিত্যে। ক্রমে চৈতন্য-প্রাণিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন-তত্ত্বেও তাঁর এক উত্তুঙ্গ প্রতিষ্ঠা ঘটে যায়। সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার শৃঙ্গার রসাত্মক চূর্ণ কবিতার কবিকুল তবু রাধার সামাজিক পরিচিতির প্রশ্নটিকে এড়িয়ে যেতে পেরেছিলেন তাঁদের সংক্ষিপ্ত রচনায়। কিন্তু , মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের গ্রামীণ সংস্কৃতির কবি বড়ু চণ্ডীদাস যখন তাঁর কাব্যে আদিরসের চটুল ভোজ্যে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন তথাকথিত অবজ্ঞাত , অশিক্ষিত বিপুল জনতাকে , তখন সেই শ্রুতিসুখের কাব্যে আখ্যান পরিবেশনার দায়েই কবিকে হাজির করতে হয়েছিল রাধাকে তার সুস্পষ্ট , সম্পূর্ণ সামাজিক পরিচিতি সমেত। কেননা , আমাদের লোকায়ত সমাজ সমস্ত কিছুকেই বুঝে নিতে চায় এক নিজস্ব পৌর্বাপর্যের বোধে। সমাজগত সেই পরিচিতিতেই ‘রাহি’ ও ‘কাহ্ন’-এর প্রণয় সমাজ-নিষিদ্ধ , অবৈধ। এ প্রেম পরকীয়া তো বটেই। শুধু তাই নয় , সমাজ-সম্পর্কের নিরিখে তা কেবলই অনাচার নয় ; ঘৃণ্য এক অজাচারও। কেননা , সামাজিকতার প্রশ্নে রাধা -কৃষ্ণের পারস্পরিক সম্পর্কটি ‘মাতুলানী’ ও ‘ভাগিনেয়’র । মধ্যযুগের বাংলার জনরুচির কাছে এই পরকীয়া প্রেমের গল্প যে শুধুই মনোমুগ্ধকর ছিল তা-ই নয় ; বরং , ওই সামাজিক স্পর্শকাতরতার কারণেই জনতা-জনার্দনের কাছে তা যে মুখোরোচক এক কিসসায় পরিণত হয়েছিল তা বেশ বোঝা যায় আমাদের লোকগান আর প্রেমগীতিতে রাধা-কৃষ্ণ মোটিফের অনিঃশেষ ব্যবহারে।

বস্তুত , সাহিত্য সংস্পৃষ্ট লোকসংস্কৃতির এই বিপুল জনসমর্থনই বাংলায় রাধাকে কৃষ্ণের পাশে এমন এক দৃঢ়প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল যে এমনকি দর্শন-তত্ত্বের জগতেও তাকে অগ্রাহ্য করবার আর কোনো উপায় ছিল না। আবার অন্যদিকে ,কৃষ্ণ-রাধার ঐ সামাজিক সম্পর্কের কারণেই মধ্যযুগের ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতি ও স্মৃতিশাসিত প্রবল পিতৃতন্ত্রের কাছে বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে এই নারী। তার অবৈধ , গর্হিত , অজাচারী প্রেমের সূত্রেই সে প্রতিমুহূর্তে নিরুচ্চার এক চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয় ব্রাহ্মণ্য সমাজাদর্শের মুখের ওপর। প্রতিনিয়ত তার শাসনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে যেন ব্যঙ্গ করতে থাকে। ফলত , মধ্যযুগের আগ্রাসী পুরুষতন্ত্র ও পিতৃতন্ত্রের কাছে এই নারী এমন এক উপদ্রব হয়ে ওঠে যাকে না যায় গেলা , না যায় ফেলা। অনেক বলপ্রয়োগ এমনকি বলাৎকারেও (স্মর্তব্য ' শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ') সেই নারীকে যখন লোপাট করা গেল না কোনোমতেই তখন তাকে নিয়ে শুরু হল অভিজাত সংস্কৃতির ছল আর কৌশলের এক নব ধারাপাত। গ্রামীণ মৃত্তিকা থেকে সে-নারীকে উপড়ে নিয়ে তাকে পুরাণের অভিজাত বলয়ে তালাবন্দি করতে চাইল সংস্কৃতির স্বঘোষিত পাণ্ডারা।কৃষ্ণজীবনকেন্দ্রিক পুরাণ ভাগবতের 'অনয়ারাধিতো' শব্দের মধ্যে সাহিত্যসম্ভূতা রাধার উৎসসন্ধানের মরিয়া প্রয়াস সেই আগ্রাসনের প্রথম প্রয়াস।

কেবল তা-ই নয় , লক্ষ করলে দেখা যাবে , কৃষ্ণের সঙ্গে রাধার সমাজ-নিষিদ্ধ সম্পর্কের অবৈধতাকেও দাম্পত্যপ্রেমের শুদ্ধির বকযন্ত্রে শোধন করে নেওয়ার এক প্রক্রিয়া শুরু হয় নানান অর্বাচীন পুরাণের পাতায় রাধাকে বিষ্ণু-পত্নী লক্ষ্মীর সঙ্গে সমীকৃত করে তোলবার প্রয়াসে। সেইসঙ্গে 'জন্মান্তরবাদ'-এর শানানো হাতিয়ারে রাধা-কৃষ্ণের মর্ত্য-সম্পর্কের বিন্যাসকে (মাতুলানী ও ভাগীনেয়) জন্মান্তরের বিভ্রাট ব'লে চালানো গেল। এমনকি পরনারী রাধার প্রতি কাহ্নের জুগুপ্সাময় অন্যায় আচরণও শাস্ত্রীয় বিচারে ন্যায্যতা পেল মায়াপৃথিবীর ঊর্ধ্বলোকে বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর অচ্ছেদ্য , শাশ্বত দাম্পত্য-সম্পর্কের অজুহাতেই।

সমাজের শিকলভাঙা , সংস্কার-উত্তীর্ণা , জীবনের সহজ স্রোতটানে প্রাণস্পন্দী এক নারীকে বশ মানানর এই খেলা যদিও সহজে ফুরোয়নি। বরং , নিতান্ত দর্শন-তত্ত্বের খাতিরেও যতবারই কেষ্ট ঠাকুরটির সঙ্গে একত্র উচ্চারিত হয়েছে রাধার নাম – ততবারই তার সামাজিক পরিচিতির অনুষঙ্গ এবং সেই কুলবধূর পরিচিতিকে নস্যাৎ করে জীবনসত্যে প্রাণিত এক স্পর্ধিনী স্বাধীন প্রেমিকা নারীর মূর্তি জেগে উঠেছে আমাদের মনে। আলোড়িত করেছে আমাদের চেতনাকে।এরই প্রবল প্রতিক্রিয়ায় 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম'-এর অভিজাত পরিসরে

দেখা দিল বাঁধ বাঁধবার চেষ্টা । রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের সামাজ-বিগর্হিত অনুষঙ্গের স্পর্শদোষ কাটাতে তাই সেই প্রেমগীতির সূচনায় হরিবাসরে হাজির করতে হল আধ্যাত্মিক প্রেমে পাগলপারা গৌরাঙ্গের দিব্যমূর্তিকে। পালাকীর্তনের আসরে অনিবার্য হয়ে উঠল রাধা-কৃষ্ণ লীলাকীর্তনের সূচনায় ‘গৌরচন্দ্রিকা’র অবতারণা।অমার্জিত জনচিত্তকে যেন এহেন উপস্থাপনায় সতর্কিত , সজাগ করতে চাইছেন ধর্মের পাণ্ডারা এই বার্তায় যে , যে-লীলাগান শুনতে বসেছেন তারা তা কোনো প্রাকৃত প্রেমের চটুল রসকথা নয় ; বরং এর মধ্য দিয়ে লোকোত্তর এক দিব্যপ্রেমধারাই সিঞ্চিত হবে তৃষাতুর ভক্তের প্রাণে। রাধা-কৃষ্ণের পরকীয়া সম্পর্ককে কার্যত স্বীকার করে নিয়েও ’চৈতন্যচরিতামৃত’-এর অশীতিপর কবি নিষেধের তর্জনী-সঙ্কেতে প্রাকৃতজনকে একথা সমঝে দিতে ভুললেন না – ‘ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস’। অর্থাৎ, আধ্যাত্মিকতার ভুবনে বিরল ব্যতিক্রমী এই রাধাপ্রেম সাধারণ সামাজিকের জীবনে কখনওই অনুসরণযোগ্য নয়। সাধারণী , সমঞ্জসা এবং সমর্থা – গৌড়ীয় বৈষ্ণব তত্ত্বে মধুরা-রতির এই ত্রিবিধ শ্রেণিকরণে রাধা হয়ে উঠলেন সমর্থাশ্রেষ্ঠা ; কিন্তু , তার বিনিময়ে নারীর স্বাভাবিক কামনা-বাসনার আততিটুকু তাকে দলে আসতে হল দু’পায়ে। স্বসুখবাসনাকে সম্পূর্ণত জলাঞ্জলি দিয়েই তিনি হয়ে উঠলেন পুরুষের প্রেমে একেশ্বরী। শেষমেশ অবশ্য তাতেও পুরোপুরি নিশ্চিন্ত থাকা যায়নি। তাই , গোস্বামীগ্রন্থে রাধা-কৃষ্ণের সমাজসিদ্ধ বিবাহ দেখিয়ে , তাকে শুচিশুদ্ধ করে তোলার হাস্যকর প্রয়াসও লক্ষ্য করি। রাধাকে নারী থেকে নক্ষত্র বানানোর এই চাতুর্যে সংস্কৃতির আধিপত্যকামী ধারাটির বেত্রশাসন এই মেয়ের থেকে সম্পূর্ণভাবে নিকিয়ে নিতে চেয়েছে যাবতীয় মৃত্তিকা-ঘনিষ্ঠতার ছাপ , তাপ। তার স্বাধীন চিন্তা-চেতনা , পরপুরুষের প্রেমপ্রস্তাবে বাম্যতা , বিরূপতা – পুরুষের অত্যাচারের সাধ্যমতো প্রতিরোধের চেষ্টা এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সমাজ-সংস্কারের মুখে ছাই দিয়ে তার প্রেমিকাসত্তার সমাজ-প্রতিস্পর্ধী সক্রিয়তাকে যেভাবে বাংলা সাহিত্যের আদিতম নাটগীতিতে ফুটিয়ে তুলেছিলেন কবি বড়ু চণ্ডীদাস – তাকে সম্পূর্ণত মুছে ফেলে সংস্কৃতির শাস্ত্রপোষিত গ্রেট ট্র্যাডিশান একমুখী তাত্ত্বিক নির্মাণে সেই রক্তমাংসের জীবন্ত নারীকে পরিণত করেছে আত্মচেতনাহীন ,সত্তাবিলোপী , আদ্যন্ত শ্যামগতপ্রাণ পুরুষতন্ত্রের পোষমানা অসহায় এক নারীতে। আর এ সবেরই বিনিময়ে ব্রাহ্মণ্যবাদী পিতৃতন্ত্রের কাঠপুতুল হয়েই রাধা হয়ে উঠেছে কৃষ্ণরতিতে সমর্থা ‘মহাভাবঠাকুরানী’ ।

তবু , সংস্কৃতির টানাপোড়েনের এই অনিঃশেষ কাহিনিতে একবগগা গা-জোয়ারিতে জিতে যায় না কোনো বিশেষ এক পক্ষ। প্রাধান্যময় ‘শিষ্ট’ বৈষ্ণব সংস্কৃতি যখন রাধাকে ধুলোমাটির লগ্নতা থেকে ছিনিয়ে নিয়ে তত্ত্বগতভাবে তাকে

প্রায় আকাশলীনা করে তোলে , ঠিক তখনই বৈষ্ণব সহজ-সাধনার ধারা তাকে নামিয়ে এনেছে ‘আরোপ-সাধনা’র প্রয়োগগত দেহচর্যায়। কিংবা , মধ্যযুগের শেষ পৈঠায় দাঁড়িয়ে কবিগান কিংবা দাশরথি রায়ের পাঁচালির মতন ‘জনপ্রিয় সংস্কৃতি’তে তাই নতুন কালের চাহিদা তত্ত্বের শিকলি কেটে রাধাকে মানবী করে তোলে অনেকাংশেই। উৎস থেকে উপান্তে সমগ্র মধ্যযুগ জুড়ে রাধার চরিত্রের এই বিচিত্র নির্মাণ নির্ভুলভাবে মনে করিয়ে দেয় যে , আমাদের সংস্কৃতির আবহমানের ইতিহাস আসলে গ্রেট ও লিটিল ট্র্যাডিশানের রতি ও বিপরীত-রতি সম্ভোগের এক চিত্তাকর্ষক অফুরান কাহিনি।

সহায়ক গ্রন্থসূচি ঃ

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য সম্পাদিত *বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সমগ্র*
শক্তিনাথ ঝা , *অন্য এক রাধা*
শশিভূষণ দাশগুপ্ত , *শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ ঃ দর্শনে ও সাহিত্যে*
সত্যবতী গিরি , *বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণকথার ক্রমবিকাশ*